জল পড়ে পাতা নড়ে

একুশে, দূর থেকে

মুহম্মদ জুবায়ের

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে একুশের প্রভাতফেরিতে আমার কখনো যাওয়া হয়নি, বয়স হয়নি বলে যেতে দেওয়া হতো না। আমাদের বগুড়ার মতো ছোটো মফস্বল শহরেও বড়োসড়ো প্রভাতফেরি হতো একুশের ভোরে, বিশ তারিখের মধ্যরাতে নয়। তবু অতো ভোরে একা যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। অথচ যুদ্ধশেষে মুক্ত-স্বাধীন দেশে ৭২-এ আমরা রাতারাতি সাবালক হয়ে উঠেছিলাম। তখন আর নিষেধ করে কে, করলেও শোনে কে! ডিসেম্বরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু'মাস পরে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি। ভোরের আলো ফোটার অনেক আগে খালি পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। মনে পড়ে বেশ ঠাণ্ডা ছিলো সেই সকালে, পাতলা কুয়াশায় মলিন মফস্বলের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের আলো আরো অনুজ্জ্বল দেখায়। এই ভোরেও রাস্তায় মানুষজন, এ গলি ও রাস্তা থেকে লোকজন বেরিয়ে আসছে। কারো কারো হাতে ফুল। কোথাও ছোটো ছোটো দল, তাদের ঘুমভাঙা অথবা রাতজাগা গলায় একুশের গান। দলের সামনে কারো হাতে ফেস্টুন।

সাতমাথার মোড়ে সেই ভোরে কতো মানুষের ভিড়। চেনা মুখ, অচেনা মুখও অনেক। কেউ পরেছে খদ্দরের পাঞ্জাবি আর গলায় চাদর। মেয়েদের পরণে লাল-পাড় সাদা শাড়ি। ব্যানার, ফেস্টুন হাতে প্রভাতফেরি। সমবেত গলায় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। মিছিল চললো শহরের এ রাস্তা থেকে সে রাস্তা। শেষ হলো সাতমাথায় ফিরে এসে। তখন সূর্য উঠে গেছে। মনে আছে, আমরা সেদিন কোনো শহীদ মিনারে ফুল দিতে যাইনি। কোন শহীদ মিনারে যাওয়া হবে, তা স্থির করা সম্ভব ছিলো না। বাংলাদেশের আর সব শহর-জনপদের মতো বগুড়া শহরেও মোড়ে মোড়ে যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে ছোটোবড়ো অনেক শহীদ মিনার! লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের দামে কেনা স্বাধীন দেশে তখনো গণকবর আবিষ্কার ও গণনা শেষ হয়নি।

ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমার প্রথম যাওয়া পরের বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবো, তার ঢের দেরি। ঢাকায় এসেছি – একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে যেতে হবে। মনিপুরিপাড়া থেকে আমার চেয়ে বয়সে সামান্য বড়ো এক চাচার সঙ্গে রাত এগারোটার মধ্যেই শহীদ মিনারে হাজির। ঢাকা শহরের কিছুই চিনি না। যতোদূর মনে পড়ে, নিউ মার্কেটের কাছাকাছি কোথাও রিকশা ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিলো। মফস্বল শহরের ছেলে আমি, একসঙ্গে এতো মানুষ কোনোদিন দেখিনি। চারদিক থেকে ধীরপায়ে আসছে মানুষের মিছিল, অনেক ঠেলাঠেলি করে শহীদ মিনারের সবশেষ সিঁড়ির পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে দেখি। এই সেই শহীদ মিনার! রোমকূপে শিহরণ তোলা সেই গর্ব আমাদের! যুদ্ধের শুরুতেই পাকিস্তানীরা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো। আজ কোথায় তারা! শহীদ মিনার আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যেমন দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ ও তার বিজয়ী মানুষেরা ।

মনে আছে, সেই রাতে শহীদ মিনারের আশেপাশে সদ্য প্রেস থেকে ছাপিয়ে আনা একুশের সংকলন ফেরি করতে দেখেছিলাম। সেই সময় এবং তারও পরের কয়েক বছর সারা বাংলাদেশ থেকেই বেরোতো

হাজার হাজার একুশের সংকলন। ঢাকা শহরে রাতে শহীদমিনারের আশেপাশে এবং সকালে বাংলা একাডেমিতে কবিদের স্বকণ্ঠে কবিতা পাঠের আসরে বইমেলার প্রাঙ্গণে স্বপ্নে-পাওয়া যুবকদের হাতে হাতে থাকতো একুশের সংকলন। নামী কবি লেখকদের পাশাপাশি অবধারিতভাবে সংকলিত হতো এইসব স্বপ্নভুকদের রচনা। একদিক থেকে দেখতে গেলে তাদের আত্মপ্রকাশের ঘটনাই সবচেয়ে বড়ো। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ দিবসে বাংলা ভাষায় রচিত নতুনদের রচনা এই সংকলনগুলিতে জায়গা পাবে, তা-ই তো স্বাভাবিক ও উপযুক্ত। ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

এই সংকলনের সবগুলোই পাতে তোলার মতো হতো তা নয়। তবু এই চর্চার প্রয়াসটি অমূল্য। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনার এলাকায় এবং সকালে বাংলা একাডেমীর বইমেলায় কবিতা পাঠের আসরটিকে সম্পূর্ণতা দিতো একুশের সংকলন। রাতভর প্রেসে বসে থেকে ছাপা-বাঁধাই শেষ করে উস্কোখুস্কো চুলদাড়িওয়ালা গর্বিত ও পরিতৃপ্ত মুখের যুবকের কাঁধের ঝোলাভর্তি তরতাজা সংকলনের কপি – এই দৃশ্য একুশের সকালের সঙ্গে একাকার হয়ে ছিলো। প্রতি বছরই অত্যন্ত সুরুচিকর এবং চমৎকার সংকলনের সংখ্যাও নেহাত নগণ্য ছিলো না। তখন বছর বছর সেরা একুশে সংকলনের জন্যে পুরস্কার দেওয়ারও রেওয়াজ ছিলো। পত্রপত্রিকার সাহিত্য পাতায় সংকলনগুলি নিয়ে আলোচনা ছাপা হতো। যতোদূর মনে পড়ে, সত্তর দশকের শেষদিকেই একুশে সংকলনের সংখ্যা কমতে থাকে। দীর্ঘকাল পরবাসী থাকার কারণে সঠিক জানা নেই, কিন্তু আশংকা করি এখন তা বিরল প্রজাতির প্রাণীদের দশা পেয়েছে অথবা একেবারেই বিলুপ্ত। প্রযুক্তির সুবাদে প্রকাশনা এখন আর আগের মতো দুরূহ নয়। লেটার প্রেসের জায়গা নিয়েছে অফসেট, হাতে কম্পোজের বদলে কমপিউটারে তা দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। প্রকাশনার খরচ জোটানোর জন্যে মুক্তবাণিজ্যের যুগে বিজ্ঞাপনও দুর্লভ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আবেগ আর উৎসাহই মনে হয় অন্তর্হিত, সাহিত্যপ্রেম এখন অনেকটাই বইমেলার প্রচারকেন্দ্রিক বলে সন্দেহ হয়। হয়তো তার মূলেও আছে প্রকাশনা শিল্পটি সহজলভ্য হয়ে যাওয়া, অন্য দশজনের সঙ্গে এক সংকলনভুক্ত না হয় নবীন লেখকরা এখন শুনি নিজের খরচে আস্ত বই প্রকাশ করে ফেলেন।

যোজন যোজন দূরে এই পরবাস জীবনে আমার শহীদ মিনারে যাওয়া নেই, বাংলা একাডেমির বইমেলা নেই, একুশের ভোরে প্রভাতফেরি নেই, কবিতাপাঠ নেই। বাংলাদেশের বাইরে বড়ো বড়ো শহরগুলিতে বাংলা ভাষাভাষীরা একুশে উদযাপন করে থাকেন। আমি যে শহরে বাস করি সেখানেও একটি অস্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। ছেলেমেয়েরা সমবেত হয়ে একুশের গান গায়, কবিতা আবৃত্তি হয়, গান হয়। নাটকও। এই উদযাপনের আবেগ-ভালোবাসা নিয়ে সন্দেহ করা চলে না। যাঁরা উদ্যোগ নেন, সৎ ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সংগঠিত করেন তাঁদের জন্যে আমার সপ্রশংস অভিনন্দন। তবু আমার যাওয়া হয় না। এর ব্যাখ্যা কঠিন, হয়তো আমার আগের জীবনের (প্রবাস জীবন তো সত্যিই অন্য আরেক জীবন) একুশের ধারণা ও অভিজ্ঞতা আমাকে কাতর করে। যা ফেলে এসেছি এবং আর কোনোদিনই হয়তো ফিরে পাওয়া হবে না – এই বোধ হয়তো আমাকে নিরুৎসাহিত করে। এর দায় সম্পূর্ণই আমার যে আমি দূরে থাকি। আমার একুশে আমি উদযাপন করি একা একা। মনে মনে। আপনমনে।